

অসুখ-বিসুখ

৮৯

এই সংখ্যায় —

- জমজমাট নাটক : ভেজাল ডাক্তার
- পতঙ্গবাহী অসুখ : কালাজ্বর
- ছোটোদের বিষাদ
- ডায়াবেটিস : নিয়ন্ত্রণ
- ওষুধে মারাত্মক অ্যালার্জি
- চিকিৎসা পরিষেবাতে অনাচার
- ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা : এক কালান্তক রোগ

(www.FoundationForHealthAction.Org)

১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

মে-জুলাই ২০১৬

সূচীপত্র

- ১ ভেজাল ডাক্তার : ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় (সম্পাদকীয়)
- ৫ পতঙ্গবাহী অসুখ : কালাজ্বর
- ৮ স্বাস্থ্য পরিবেশায় বিশ্বাসযোগ্যতা
- ১১ ডায়াবেটিসে নজরদারি : জটিলতা এড়ানো
- ১৬ কেমন হবে একজন ডায়াবেটিক রোগীর খাদ্যাভ্যাস?
- ১৮ ছোটোরা বিষাদে আছে
- ২১ কার্ডিয়াক স্টেন্ট : বহুজাতিকদের হুমকি
- ২২ ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা : এক কালান্তক রোগ
- ২৫ চিকিৎসা পরিবেশাতে অনাচার : দিশেহারা স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীরা
- ৩১ অ্যাড্রেনালিন ইঞ্জেকশন : যে ওষুধ রোগী ও ডাক্তার—দু'জনকেই বাঁচায়
- ৩২ বুমুর গান

ফাউন্ডেশন ফর হেলথ অ্যাকশানের কয়েকটি প্রচেষ্টা :

- ইংরেজী ভাষায়, মূলত চিকিৎসকদের জন্য Bulletin On Drug & Health Information (BODHI)-র প্রকাশ
- স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা সভা এবং কর্মশালার আয়োজন করা
- গ্রামীণ চিকিৎসকদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু রাখা
- স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে বইপত্র প্রকাশ করা
- ওষুধ ও চিকিৎসা বিষয়ে নিরপেক্ষ তথ্য সরবরাহ করা
- যথাসম্ভব যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসার অনুশীলন করা ও গ্রামীণ চিকিৎসাকর্মী তৈরির উদ্দেশ্যে আমাদের হাসপাতাল পরিচালনা করা

ফাউন্ডেশন ফর হেলথ অ্যাকশানের (একটি মুনাফাবিহীন, জনকল্যাণমুখী ট্রাস্ট) লক্ষ্য :

- অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা এবং ক্ষতিকারক ও ফালতু ওষুধের বিলোপ এবং যুক্তিপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ওষুধের প্রসার।
- বিভিন্ন সংগঠন এবং গোষ্ঠীর সাথে সম্মিলিত ভাবে বঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার অর্জনের আন্দোলনে সামিল হওয়া।
- চিকিৎসা-ক্ষেত্রের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং চিকিৎসকদের প্রকৃত তথ্য জানার অধিকারের দাবিকে জোরদার করা।

ডায়াবেটিসে নজরদারি : জটিলতা এড়ানো

ডা. পূর্ণব্রত গুণ

অগ্ন্যাশয়ে ইনসুলিন তৈরি হওয়া কমে গেলে বা বন্ধ হয়ে গেলে, অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন বেরোনো কমে গেলে বা বন্ধ হয়ে গেলে অথবা ইনসুলিনের কাজ করার ক্ষমতা কমে গেলে যে রোগ হয় তার নাম ডায়াবেটিস মেলাইটাস বা মধুমেহ। ডায়াবেটিস শরীরের নানা অঙ্গের ক্ষতি করতে পারে।

ডায়াবেটিস সম্পর্কে সাধারণ তথ্যগুলো একটু ঝালিয়ে নিয়ে মূল আলোচনায় ঢুকবো।

ইনসুলিন রক্ত থেকে গ্লুকোজকে শরীরের কোষে ঢুকতে সাহায্য করে, সেখানে গ্লুকোজ জ্বালিয়ে শক্তি তৈরি হয়। এছাড়া লিভারের কোষে বিভিন্ন ভাঙাগড়ার কাজেও সাহায্য করে ইনসুলিন। ডায়াবেটিস মেলাইটাস-এ রক্তে গ্লুকোজ থাকা সত্ত্বেও শরীরের কোষগুলো তাকে কাজে লাগাতে পারে না, রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়।

ডায়াবেটিসের প্রকারভেদ রয়েছে

- ১। টাইপ ১ ডায়াবেটিস: এই অবস্থায়ই ইনসুলিন তৈরি খুব কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়, তাই ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।
- ২। টাইপ ২ ডায়াবেটিস: এঁদের ইনসুলিন তৈরির ক্ষমতা অল্প কমে বা একদমই কমে না। কিন্তু ইনসুলিনের কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়।
- ৩। অপুষ্টিজনিত ডায়াবেটিস: আমাদের মতো গরিব দেশের মানুষদের খাবারে প্রোটিন থাকে কম বা প্রায় শূন্য। তাঁরা বেশির ভাগটা শ্বেতসার জাতীয় খাবার খান। ফলে ইনসুলিন উৎপাদনকারী অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষগুলো ক্রমশ খারাপ হতে

হতে শেষ অবধি নষ্ট হয়ে যায়। এই ধরনের চিকিৎসায় তাই ইনসুলিন দিতে হয়।

- ৪। অন্য অসুখের কারণে এবং গর্ভাবস্থায়ও ডায়াবেটিস দেখা দিতে পারে।

ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয় করা হয় রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা মেপে।

রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা (মিলিগ্রাম প্রতি ডেসিলিটারে)

	খালি পেটে	গ্লুকোজ খাওয়ার ২ ঘণ্টা পর
স্বাভাবিক	১১০-র কম	১৪০-এর কম
বিকৃত গ্লুকোজ	১১০ থেকে	১৪০ থেকে
টলারেঞ্চ	১২৪	২০০
ডায়াবেটিস	১২৫-র বেশি	২০০-র বেশি

ডায়াবেটিস একটা ক্রমিক বা দীর্ঘস্থায়ী রোগ, যাতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানান জটিলতা দেখা দেয়—

- ০ করোনারি ধমনীর রোগ, যা থেকে হতে পারে হার্ট অ্যাটাক।
- ০ মস্তিষ্কের ধমনীর রোগ, যা থেকে স্ট্রোক হতে পারে।
- ০ রেটিনোপ্যাথি যা অন্ধত্ব ডেকে আনতে পারে।
- ০ নিউরোপ্যাথি যার জন্য অঙ্গচ্ছেদও করতে হতে পারে।

মুশকিল হলো এইসব জটিলতার প্রথম অবস্থায় কোনো উপসর্গ থাকে না, জটিলতা অনেকটা বাড়ার পর রোগী কষ্ট অনুভব করেন। তাই জটিলতা এড়ানো বা কম রাখার একমাত্র উপায় হলো ডাক্তারি

নজরদারিতে থাকা আর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাকে কড়া বাঁধন বেঁধে রাখা।

ডায়াবেটিস হার্ট আর রক্তনালির জটিলতা :

এগুলোকে এড়ানোর উপায় হলো—

- ৩ ধূমপান ছেড়ে দেওয়া।
- ৩ জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনে আর প্রয়োজনে ওষুধ খেয়ে উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা কমানো।
- ৩ রক্ত পরীক্ষা করে কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা দেখা, বেশি থাকলে খাবার-দাবার নিয়ন্ত্রণ করা। কারুকে ওষুধ খেতেও হয়, সাধারণত কোনো স্ট্যাটিন (যেমন অ্যাটরভাস্ট্যাটিন)। সে সব ডায়াবেটিস রোগীর বয়স ৪০ বছরের বেশি তাঁদের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা যদি স্বাভাবিকও থাকে, তাহলেও তাঁদের স্ট্যাটিন দিলে ভবিষ্যতে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং মৃত্যুর ঝুঁকি কমে বলে দেখা যায়।
- ৩ যাঁদের হার্টের বা ধমনীর অসুখ আছে বা হওয়ার ঝুঁকি বেশি, তাঁদের অ্যাস্পিরিন দেওয়া উচিত।

ডায়াবেটিসে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

ডায়াবেটিসের দীর্ঘস্থায়ী জটিলতাগুলো হয় রক্তনালির ওপর বেশি ব্লাড সুগারের কারণে। টাইপ ১ এবং টাইপ ২-দুই ধরনের ডায়াবেটিস রোগীদের ওপরই গবেষণা করে দেখা গেছে—স্বাভাবিক মাত্রার কাছাকাছি ব্লাড সুগারের মাত্রা রাখা গেলে জটিলতা কম হয়।

কিন্তু ব্লাড সুগার কড়া নিয়ন্ত্রণের রাখলে বেশি কমে গিয়ে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার ভয় থাকে। সকালে খালি পেটে এবং দুপুরে ও রাতে খাওয়ার আগে ব্লাড সুগার ৮০ থেকে ১২০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার রাখাটা লক্ষ্য হওয়া উচিত।

রক্তে শর্করা কতটা নিয়ন্ত্রণে আছে তা দেখার জন্য গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন (HbA_{1c}) নামে আরেকটা পরীক্ষা করা যায়। পরীক্ষাটা অবশ্য খরচের। এর থেকে বোঝা যায় আগের ১ থেকে ৩ মাসে ব্লাড সুগারের মাত্রা কেমন ছিলো। HbA_{1c}-র মাত্রা ৭% বা তার নিচে রাখতে হয়। HbA_{1c}-র মাত্রা ৭% মানে হলো গড়ে ব্লাড সুগারের মাত্রা ১৫০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার। বয়স্কদের ক্ষেত্রে অবশ্য HbA_{1c}-র লক্ষ্যমাত্রা একটু বেশি রাখা হয় হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ঝুঁকি এড়ানোর জন্য। দেখা গেছে HbA_{1c}-র মাত্রা একটু কমানো গেলে জটিলতা হওয়ার ঝুঁকি বেশ খানিকটা কমে।

টাইপ ১ ডায়াবেটিসে ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সব সময়ই ইনসুলিন লাগে।

টাইপ ২ ডায়াবেটিসে অনেক সময় জীবনযাত্রার পরিমার্জন (খাবার-দাবার নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম) করেই ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। বাকিদের মুখে খাবার ওষুধ দিতে হয়। মুখে খাবার ওষুধ কাজ না করলে ইনসুলিন লাগে।

ডায়াবেটিসে চোখের রোগ

ডায়াবেটিসের অন্যতম জটিলতা হলো রেটিনার রোগ — ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি (রেটিনার রক্তনালি-গুলোর রোগ)। এছাড়াও ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে ছানি ও গ্লুকোমা হওয়ার ঝুঁকি বেশি। নিয়মিত চোখ পরীক্ষা করলে প্রথম অবস্থায়ই রোগ ধরা পড়ে। তখন চিকিৎসা করলে দৃষ্টিশক্তি প্রায় অটুট রাখা যায়। এই কারণে নিয়মিত চোখের ডাক্তার দেখাতে হয়।

রেটিনা চোখের একদম ভেতরের স্তর। রেটিনা দেখতে হলে বিশেষ ড্রপ দিয়ে চোখের মণিকে বড়ো করে অপথ্যাল্মোস্কোপ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয়। চোখে আলো পড়লে মণি ছোটো হয়ে যায়, তার মধ্যে দিয়ে পুরো মণিটা দেখা যায় না, তাই মণিকে বড়ো করার জন্য

ড্রপ দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে রেটিনার ছবি তুলে রাখা হয়।

কি ধরনের ডায়াবেটিস, কতদিন ধরে ডায়াবেটিস আছে, অন্য কোনো রোগ আছে কিনা—এই সব বিষয়ের ওপর নির্ভর করে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির ঝুঁকি কতটা।

টাইপ ১ ডায়াবেটিসে ডায়াবেটিস ধরা পড়ার ৫ বছর পর থেকে চোখ পরীক্ষা শুরু করতে বলা হয়, তবে বয়ঃসন্ধির আগে সাধারণত চোখ পরীক্ষা করার দরকার পড়ে না। কারোর দৃষ্টিশক্তির সমস্যা থাকে যদি, তবে চশমা ব্যবহার করতে হয়, তাদের আরো আগে চোখ পরীক্ষা করতে হতে পারে। প্রথম পরীক্ষার পর ১ থেকে ২ বছর ছাড়া পরীক্ষা করাতে হয়। পরীক্ষার খারাপ কিছু পাওয়া গেলে আরো আগে পরীক্ষা করাতে হতে পারে।

টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে কিন্তু রোগ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ পরীক্ষা করতে হয়। কেন না সাধারণত এই ধরনের ডায়াবেটিসে রোগ ধরা পড়ার আগে কয়েক বছর ধরেই ব্লাড সুগার বাড়তে থাকে। এই সময়ে কোনো উপসর্গ ছাড়াই চোখের সমস্যা থাকতে পারে। শুরুতেই পরীক্ষা করলে সমস্যা আছে কি না, থাকলে কতোটা গুরুতর, তার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন আছে কি না—এসব বোঝা যায়। সমস্যা কিছু না থাকলে প্রথম চোখ পরীক্ষার ১ থেকে ২ বছর ছাড়া ছাড়া চোখ পরীক্ষা করাতে হয়।

ডায়াবেটিসে পায়ের যত্ন:

ডায়াবেটিসে পায়ের রক্ত চলাচল কমে যেতে পারে, তাছাড়া স্নায়ুগুলোতে রক্ত চলাচল কমে যাওয়ার জন্য অনুভূতি কমে যায়। ফলে আঘাত লাগলে ব্যথার অনুভূতি হয় না, ক্ষতে বারবার আঘাত লাগে, ক্ষত গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। ডায়াবেটিসে পায়ের ঘা খুব দেখা যায়, অনেক সময় বাড়াবাড়ি

হওয়ার আগে রোগী খেয়ালও করেন না, ব্যথার অনুভূতি না থাকার জন্য। ওই জটিলতা এড়াতে ঘরের বাইরে চলাফেরার সময় ভর্তি (পায়ের পাতা ঢাকা) জুতো ব্যবহার করা উচিত।

ডায়াবেটিস রোগীদের প্রতিদিন পায়ের সমস্তটা দেখা উচিত, বিশেষ করে পায়ের আঙুলের ফাঁকগুলো। কোথাও চামড়া ফেটেছে কি না, ঘা বা ফোঁসা হয়েছে কি না, গরম বা লাল কি না, কড়ায় কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কি না—দেখা দরকার। স্নান করার সময় বা জামাকাপড় পরার সময় দেখে নেওয়া যায়। পায়ের নীচটা পুরো দেখার জন্য আয়না ব্যবহার করা যায়। আয়না দিয়ে দেখতে অসুবিধা হলে পরিবারের কারুর সাহায্য নেওয়া যায়।

ডাক্তারি পরীক্ষার সময় ডাক্তারের দেখা উচিত পায়ের রক্ত চলাচল ও অনুভূতি ঠিক আছে কি না, কোনো ঘা আছে কি না, পা ঠান্ডা কি না, চামড়া পাতলা কি না, নীলচে কি না, চামড়া ফেটেছে কি না।

টাইপ ১ ডায়াবেটিসে রোগ নির্ণয়ের ৫ বছর পর থেকে পায়ের পরীক্ষা শুরু করলে চলে।

টাইপ ২ ডায়াবেটিসে প্রথম থেকেই পরীক্ষা করতে হয়।

ডায়াবেটিসে কিডনির রোগ

ডায়াবেটিসে কিডনির স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে—একে বলা হয় ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি। পেছাপ পরীক্ষা করে অ্যালবুমিনের মাত্রা দেখে বোঝা যায় কিডনির ছাঁকনি ক্ষমতা ডায়াবেটিসের জন্য কমে গেছে কি না। পেছাপে অল্প পরিমাণে অ্যালবুমিন (microalbuminuria) থেকে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি শুরু হয়েছে কি না বোঝা যায়। পেছাপে অ্যালবুমিনের পরিমাণ বাড়লে নেফ্রোপ্যাথি খারাপ হচ্ছে বোঝা যায়।

টাইপ ১ ডায়াবেটিসে রোগ-নির্ণয়ের পাঁচ বছর পর থেকে আর **টাইপ ২ ডায়াবেটিসে** রোগ ধরা পড়ার

পর থেকেই পেছাপ পরীক্ষা শুরু করা উচিত।

পেছাপে অ্যালবুমিন থাকলে ব্লাড সুগার এবং রক্তে চর্বি (কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসেরাইড)-র মাত্রা কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত।

অ্যালবুমিনুরিয়া ভালো না হলে রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকলেও রক্তচাপ কমানোর ওষুধ-এসিই ইনহিবিটর (যেমন এনালপ্রিল) বা এআরবি (যেমন লোসার্টান) দেওয়া হয়। এরা পেছাপে অ্যালবুমিনের পরিমাণ কমায়, ডায়াবেটিস জনিত কিডনির রোগকে প্রতিহত করে বা রোগ হওয়ার গতি কমায়।

ডায়াবেটিসে উচ্চ রক্তচাপ

অনেক ডায়াবেটিস রোগীরই সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপও থাকে। উচ্চ রক্তচাপে সাধারণত কোনও উপসর্গ না থাকলেও এর জন্য দু'ধরনের খারাপ প্রভাব পড়ে: রক্ত সংবহনতন্ত্রে চাপ পড়ে এবং কিডনি ও চোখে ডায়াবেটিস-জনিত জটিলতা তড়াতাড়ি বাড়ে।

ডায়াবেটিস রোগীদের কিডনির রোগ না থাকলে ১৪০/৯০ মিমি পারদ রক্তচাপের নিচে রাখলেও চলে, কিন্তু কিডনির রোগ থাকলে ১৩০/৮০ মিমি পারদের নিচে রাখতে হয়।

যদি ডায়াবেটিস রোগীর রক্তচাপ ১২০/৮০ মিমি পারদ-এর বেশি থাকে তাহলে তাঁকে ওজন কমিয়ে, ব্যায়াম করে, খাবারের নুন কমিয়ে, ধূমপান ছেড়ে আর মদ্যপানের মাত্রা কমিয়ে রক্তচাপ স্বাভাবিকে আনতে পরামর্শ দেওয়া হয়। তাতে রক্তচাপ পুরোটা না কমলে বা দ্রুত রক্তচাপ কমানোর জন্য ওষুধ দেওয়া হয়।

ডায়াবেটিসে নাভের রোগ

ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি : ডায়াবেটিস রোগীদের প্রায় ৭০%-এর এই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। স্নায়ুর গায়ে থাকা সূক্ষ্ম রক্তনালির ক্ষতির ফলে রক্ত চলাচলে বিঘ্ন

প্রাক্তীয় অর্থাৎ পেরিফেরাল ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথিতে পায়ে ব্যথা, জ্বালা এবং অসাড়ভাব হয়। সাধারণত পায়ের আঙ্গুলে সমস্যা শুরু হয়। তারপর হাত এবং শরীরের অন্যান্য অংশেও সমস্যা দেখা যায়।

অটোনমিক নিউরোপ্যাথিতে আমাদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোর স্নায়ুগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার ফলে যৌন ক্ষমতা হ্রাস, পাকস্থলীর সমস্যা (gastroparesis), পেছাপ করার নিয়ন্ত্রণ হারানো, মাথা ঝিমঝিম করা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া—এই সব সমস্যা হতে পারে।

ডায়াবেটিসে দাঁত ও মাড়ির রোগ

ডায়াবেটিসে দাঁতের গোড়ায় ময়লা জমে মাড়ি ফোলা ও লাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। নিয়মিত দাঁত মাজা, দাঁতের ফাঁকের ময়লা পরিষ্কার করার মাধ্যমে মাড়ির রোগ কম রাখা যায়।

গর্ভাবস্থা ও ডায়াবেটিস

যাঁরা গর্ভবতী হওয়ার পরিকল্পনা করছেন বা ইতিমধ্যেই গর্ভবতী হয়েছেন তাঁদের ডায়াবেটিস ও ডায়াবেটিসের সম্ভাব্য জটিলতাগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গর্ভাবস্থার আগে ও গর্ভাবস্থার সময় ব্লাড সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখলে মা ও শিশুর অনেক জটিলতার সম্ভাবনা কমে।

ডায়াবেটিসের জটিলতা : হাইপোগ্লাইসিমিয়া

রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে খুব কমে যাওয়াকে বলে হাইপোগ্লাইসিমিয়া।

ডায়াবেটিস রোগীদের হাইপোগ্লাইসিমিয়া হয় এইসব কারণে—

- ১ খুব কম খাওয়া বা দেরি করে খাওয়া।
- ২ স্বাভাবিক যা পরিশ্রম করেন তার চেয়ে বেশি করা।
- ৩ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মাত্রায় ইনসুলিন নেওয়া বা ডায়াবেটিসের মুখে খাওয়ার ওষুধ খাওয়া।

রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে প্রতি ডেসিলিটারে ৪০ মিলিগ্রাম বা তার কম হলে হাইপোগ্লাইসিমিয়ার উপসর্গ দেখা যায়।

প্রথমে মাথা ঝিমঝিম করে, চোখ অন্ধকার হয়ে আসে, খুব খিদে পায়, গা-বমি ভাব হয়, কথা জড়িয়ে আসে। এই অবস্থায় খুব তাড়াতাড়ি ১০ গ্রাম মতো গ্লুকোজ বা একমুঠো চিনি বা ৩-৪ টুকরো মিছরি বা যে কোনো মিষ্টি খেয়ে নিতে হয়। সব ডায়াবেটিস রোগীরই সব সময় সঙ্গে গ্লুকোজ বা চিনি রাখা দরকার।

খুব তাড়াতাড়ি রক্তের গ্লুকোজ কমতে থাকলে বা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা খুব কমে গেলে রোগী অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকেন কেন না তাঁর মস্তিষ্কের কোষে গ্লুকোজ ঢোকে না। স্বভাবতঃ ভদ্র রোগী এমন গালাগালি করতে পারেন যেন মনে হয় তিনি মদ খেয়েছেন। এই সময় রোগীকে জলে গ্লুকোজ গুলে খাওয়াতে হয়।

হাইপোগ্লাইসিমিয়া তীব্র হলে রোগী অচেতন হয়ে যান, তাঁর মৃগীর মতো খিঁচুনি হতে পারে। এই সময় তাঁকে গ্লুকোজ খাওয়ানো যায় না। এই অবস্থায় গ্লুকাগন ইঞ্জেকশন দিলে মাৎসপেশী ও লিভারে জমা গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ রক্তে আসে। ডাক্তার রোগীর শিরায় গ্লুকোজের দ্রবণ দিয়েও হাইপোগ্লাইসিমিয়া ঠিক করতে পারেন।

ডায়াবেটিসের আরও হঠাৎ করে হওয়া জটিলতা

১ ডায়াবেটিক কিটোএসিডোসিস- এই অবস্থায় রক্তে অ্যাসিড জমে আর পেছাপের সঙ্গে কিটোন বার হয়। প্রথমে বারবার পেছাপ হওয়া, খুব তেষ্ঠা পাওয়ার সঙ্গে প্রচণ্ড ক্লান্তি, গা-বমি ভাব ও বমি হয়। চিকিৎসা সময়ে না হলে বিমুনি ভাব ও পরে গভীর অচেতনতা হয়। এই অবস্থার যথাযথ চিকিৎসা না হলে প্রাণহানি হতে পারে।

- ১ হাইপার-অসমোলার ননকিটোটিক কোমা-এই অবস্থায় রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা খুব বেড়ে যায়, শরীর জলশূন্য হয়ে যায়, রোগী অচেতন হয়ে যান। এই অবস্থারও দ্রুত চিকিৎসা হওয়া দরকার।
- ২ রোগী নির্দেশ মানছেন কি না।
- ৩ ডাক্তারি পরীক্ষায় যে সব জটিলতা ধরা পড়ে তেমন কিছু হচ্ছে কিনা।
- ৪ রক্তচাপ কত? সিস্টোলিক রক্ত-চাপ ১০০ থেকে ১৩০ মিমি পারদ এবং ডায়াস্টোলিক রক্ত-চাপ ৬০ থেকে ৮০ মিমি পারদ থাকা ভালো।
- ৫ রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা খালি পেটে ৮০ থেকে ১২০ এবং সকালে জল খাবার খাওয়ার ২ ঘণ্টা পর ৮০ থেকে ১৬০ মিলিগ্রাম প্রতি ডেসিলিটারে থাকা ভালো।
- ৬ পয়সায় কুলোলে দুই মাস ছাড়া গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা করলে আগের দুই মাসে রক্ত শর্করার নিয়ন্ত্রণ কেমন ছিলো জানা যায়।
- ৭ রক্তে চর্বি মাত্রা দেখার জন্য লিপিড প্রোফাইল বছরে একবার করানো গেলে ভালো।
- ৮ মোটা মানুষদের বছরে একবার রক্ত-রসের ইউরিক অ্যাসিড মাপা উচিত।
- ৯ কিডনি ঠিক-ঠাক কাজ করছে কিনা দেখার জন্য বছরে অন্তত একবার রক্তের ক্রিয়াটিনিন মাপা দরকার।
- ১০ ডায়াবেটিস ধরা পড়ার সময় এবং তারপর ৬ মাস ছাড়া চোখ ও ন্নায়ু পরীক্ষা করানো দরকার যাতে কোনও জটিলতা হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
- ১১ হার্টের অসুখ হচ্ছে কিনা বোঝার জন্য প্রথমে একবার, তারপর কোনও উপসর্গ না থাকলেও বছরে একবার ইসিজি করা দরকার।